ঐতিহ্য রজতজয়ন্তী গ্রন্থমালা ১

শতাব্দীর কণ্ঠস্বর

তাজউদ্দীন আহমদ

কন্যার চোখে পুত্রের চোখে

শারমিন আহমদ

সোহেল তাজ

ঐতিহ্য

প্রকাশকের কথা

একটি বৈঠকি আলোচনার শ্রুতিলেখ্য ‘কন্যার চোখে পুত্রের চোখে’। মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কান্ডারি, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবর্ষে ‘ঐতিহ্য’ আয়োজিত এক সভায় শহিদ পিতাকে নিয়ে কথা বলেন কন্যা শারমিন আহমদ এবং পুত্র সোহেল তাজ। সন্তানের নিকট বাবা যে কত বড় আর মহান তার প্রতিচ্ছায়া এখানে বিধৃত হয়েছে। কন্যা এবং পুত্র উভয়েই বাবার জীবনের বিচিত্র দিক তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পিতা তাজউদ্দীন আহমদের সাহসী ভূমিকার কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে দেশ গঠনে তার অনবদ্য অবদানের কথা। প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য এবং উন্মোচিত হয়েছে বিতর্কিত ও অমীমাংসিত সত্যের।

ক্ষমতাচ্যুত হাসিনা সরকারের অন্যতম দুরভিসন্ধি ছিল ইতিহাসকে বিকৃতি করা এবং নিজেদের মতো ইতিহাসের বয়ান তৈরি করা। তাদের বয়ানে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়ে ওঠে একক ব্যক্তির সাফল্য। অপরাপর ব্যক্তিকে ইচ্ছে করেই খাটো বা নাই করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ না বলে তারা একক দলের যুদ্ধ হিসেবে বয়ান চালু করে। হাসিনা সরকার তার সময়কালে সর্বত্র শেখ মুজিবের স্তুতিতে মুখর করে রেখেছিল। এতে করে শেখ মুজিবকে আসলে বড় করা হয়নি বরং তাকে খাটো করা হয়েছে; যার জাজ্বল্যমান প্রমাণ ২০২৪-এর ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে মহান রাজনীতিবিদ তাজউদ্দীন আহমদের পূনর্মূল্যায়ন আজ সময়ের দাবি। বইটি নিঃসন্দেহে সেই দাবিরই একটি ফলক। রাষ্ট্রের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করেন তাদের যদি ভুলে যাওয়া হয়, অবমূল্যায়ন করা হয় তাহলে রাষ্ট্রে নেমে আসে দুর্বিপাক; যা আমরা ইতিহাসে লক্ষ করেছি। তাইতো আমাদের উচিত ত্যাগীর ত্যাগের যথাযথ মূল্যায়ন করা।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটা হয়নি যে, স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেওয়া নেতৃস্থানীয় একজন আত্মসমর্পণ করে বা ধরা দেয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ঘোষণা না দিয়েই বাংলাদেশের আপামর জনতাকে অরক্ষিত রেখে শেখ মুজিব স্বেচ্ছায় পাকিস্তানীদের হাতে বন্দি হন। ইতিহাসের অনিবার্যতায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেন মেজর জিয়াউর রহমান।

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যে বিতর্ক আছে এই বই পাঠে সেই বিতর্কের অবসান হবে। একই সাথে এই বই শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নতুন করে মহিমান্বিত করার সূত্রমুখ হবে; কেননা, মহান মুক্তিযুদ্ধে অনবদ্য অবদান রাখা সত্ত্বেও দেশপ্রেমিক জিয়াউর রহমানকে আওয়ামী লীগ যে কী পরিমাণ হেয় বিষোদ্গার আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে তা ব্যক্তি মাত্রই কারো অজানা নয়। জিয়াউর রহমান মহান স্বাধীনতার জন্য যা করেছেন তা এই বইতে তাজউদ্দীন আহমদের পুত্র সোহেল তাজের মুখে স্পষ্টতার সাথেই এসেছে। অন্যদিকে কন্যা শারমিন আহমদের ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পাই, ১৯৭২ সালে পার্লামেন্টে তৎকালীন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরজাহান মোর্শেদ প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'বঙ্গবন্ধু! উই ওয়ান্ট টু নো, কবে কোথায় আপনি কীভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন? আমরা সেটা জানতে চাই।'

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাজউদ্দীন আহমদ এক মহান নেতা; এক অমোচনীয় নাম। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস কেবল এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই অনেক বছর ধরে চর্চিত হচ্ছিল। আর মুছে দেওয়া হচ্ছিল একে একে তাজউদ্দীন আহমদের মতো দুর্দম্য ও দূরদর্শী নেতাকে। এই একক ও নিজের মতো করে বানানো ইতিহাসের খোলস থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসকে যে কারারুদ্ধ করে রাখা যায় না, সত্য যে সবসময় তার অবিনাশী রূপ নিয়ে ফিরে আসে এই গণঅভ্যুত্থান তার প্রমাণ।

৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'শতাব্দীর কণ্ঠস্বর তাজউদ্দীন আহমদ : কন্যার চোখে, পুত্রের চোখে' শীর্ষক সভাটি ছিল মূলত স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন সভা। শহিদ পিতাকে নিয়ে কথা বলেন কন্যা এবং পুত্র। সভা-সঞ্চালক বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক আহমাদ মোস্তফা কামালের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ইতিহাসকে নিয়ে এসেছে আমাদের সম্মুখে, তার প্রতি রইল অশেষ ধন্যবাদ। তাজউদ্দীন কন্যা শারমিন আহমদ ও পুত্র সোহেল তাজের প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা ইতিহাসের চূড়ান্ত অনেক সত্যকে উন্মোচনের জন্য। অনুষ্ঠানটির শ্রুতিলিখন করে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছে সাবিরা মারিয়াম মুশফি। আশাকরি, পাঠক এখানে অবরুদ্ধ ও সত্য ইতিহাসের সন্ধান পাবেন। অগণন প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভূমিতে শান্তির সমীরণ বয়ে চলুক এ আমাদের হার্দিক কামনা।

আহ্‌মাদ মোস্তফা কামাল :

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জানেন, তাজউদ্দীন আহমদ আমাদের জাতির ইতিহাসের অন্যতম প্রধান মানুষ।

আমরা তার সম্বন্ধে জানব, তার ব্যক্তিজীবন, তার রাজনৈতিক জীবন এবং জানব তার সন্তানদের মুখ থেকে– তার বড় কন্যা শারমিন আহমেদ এবং তার একমাত্র পুত্র সোহেল তাজের কাছ থেকে।

তো, আমি একটু বলি। আমার নিজের একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা, তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আমার নিজের পরিচয় ঘটল কী করে— সেটা একটু বলি। শুরু করি আপা?

সেটা হলো যে, আমরা যখন বেড়ে উঠেছি, আমার জন্ম হচ্ছে '৬৯ সালে, ডিসেম্বর মাসে। তো আমি যখন বেড়ে উঠেছি, আমার কৈশোর যখন– তখন আশির দশক এবং ওই সময়টাতে আপনারা জানেন যে, দেশের অবস্থা কী ছিল। তো আশির দশক, নব্বই দশকে আমরা দেখলাম, একটা বিতর্ক চলছে— ঘোষণা বিতর্ক।

অর্থাৎ, স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছিলেন— এটা। কিন্তু আমার নিজের পরিবারও মুক্তিযুদ্ধের পরিবার, আমার ভাইরা, চাচারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। তো তাদের কাছে আমি— আমার কৌতূহল, নানান ধরনের কৌতূহল ছিল, অনেক কিছু জানতে চাইতাম যে, যুদ্ধ কীভাবে পরিচালিত হয়েছে। তারা একটা কথা বলতেন যে, এত কথা! কিন্তু

তাজউদ্দীন আহমদের কথা আমরা শুনি না! কারণ তার নেতৃত্বেই তো আমরা যুদ্ধ করেছি।

তো আমার আগ্রহ তো ঢের! তখন অনেক বইটই পাওয়া যেত না। বইগুলো বের হওয়া শুরু হয়েছে অনেক পরে। আমি এই যুদ্ধটা কীভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং ওই সরকার কীভাবে পরিচালিত হয়েছে, সেটা জানবার জন্য নানাভাবে খোঁজা শুরু করলাম।

খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম যে, এত বড় একটা ভূমিকা পালন করবার পর, ফরাসি সরকার কিংবা বিপ্লবী সরকার—আমরা যাই বলি না কেন, যুদ্ধকালীন সরকারকে বিপ্লবী সরকারই বলা হয়। এই সরকারটি পরিচালনা করবার পর, রাজনৈতিকভাবে বা কূটনৈতিকভাবে কিংবা রণকৌশলের দিক দিয়ে, সবদিক দিয়েই সফলভাবে একটি যুদ্ধ পরিচালনা করে দেশ স্বাধীন করার পরেও তাজউদ্দীন আহমদের নাম কোথাও নেই।

তো আমি যতটুকু জানলাম, জেনে একটা লেখা তৈরি করলাম। লেখাটার শিরোনাম ছিল, 'ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাসের কারচুপি'। এই 'কারচুপি' শব্দটা বলার একটা কারণ আছে এবং ইতিহাসের বিকৃতি হচ্ছে, এটা সবাই বলে। সব জায়গায় সবাই বলে ইতিহাস বিকৃতি, ইতিহাস বিকৃতি। সব দল কিন্তু একই কথা বলে, সব মানুষ একই কথা বলে।

কিন্তু ইতিহাসের যে কারচুপি হয়, সেটা আমি দেখলাম তাজউদ্দীন আহমদের নামটা ইতিহাস থেকে যেন একদম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেটা কিন্তু আমি এখনকার কথা বলছি না, আমি বেশ আগের কথা বলছি। নব্বইয়ের

দশকের শেষের দিকে কিংবা ২০০০ সালের পরের দিকে, এই সময়ের কথা বলছি।

যখন আমার ওই লেখাটা লিখেছিলাম তখনকার কথা বলছি। তখন আমি ঠিক জানতাম না যে, এই লেখাটা কোথাও প্রকাশিত হবে কি না। কারণ, আমি লিখেছি একদম তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে, সরাসরি তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধে তার সরকার কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং তার ভূমিকা কী ছিল এবং যুদ্ধ যেহেতু জটিল একটা বিষয়, সেহেতু সেটা পরিচালনার জন্য যে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লাগে, সেটা যে এমনি এমনি ঘোষণা হয়ে গেল আর দেশ স্বাধীন হয়ে গেল— এভাবে তো আর হয় না।

ওইটাই দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম ওই লেখায়। আমি জানতাম না যে কোথাও প্রকাশিত হবে কি না, কিন্তু তখন 'সাপ্তাহিক ২০০০' নামের একটা পত্রিকা ছিল, যেটা সম্পাদনা করত শাহাদাত চৌধুরী। লেখাটা আমি এই পত্রিকায় দিলাম এবং এক সময় ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়, বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করল এটা নিয়ে— ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাসের কারচুপি। কারচুপি শব্দটা, ইতিহাসে যে কারচুপি হয় সেটাই দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল এবং বোধহয় আমার মনে পড়ে যে যতদূর ওইদিনই, ১৬ ডিসেম্বর, কত সালে সেটা আমার ঠিক মনে নেই– আমি একটা ফোন পাই রিমি আপার কাছ থেকে।

সিমিন হোসেন রিমি, তো ওনার কাছ থেকে একটা ফোন পাই। তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও বিহ্বল হয়ে বলেন, 'আমি জানতাম না যে, তরুণ প্রজন্মের মধ্য থেকেও কেউ এই কথাগুলো ভাবে।'

যাই হোক আমি আর এই গল্প বাড়াব না। এই প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে আমার কথা হয়েছিল আপনাদের আম্মা, জোহরা তাজউদ্দীনের সঙ্গে। সেটা আমার সৌভাগ্য যে ওই সময়ে আমি নিজেও বেশ কিছু জানতে পেরেছিলাম। তারপরে এটাও একটা নেশা হয়ে যায়। মানে এই মুক্তিযুদ্ধের যে আড়ালের পর্বটি, সেটি জানার জন্য।

তারই ধারাবাহিকতায় বোধহয় আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কথা বলবার জন্য। তো আমরা কথা শুরু করব। কিন্তু শুধুমাত্র যে রাজনীতিবিদ তাজউদ্দীন আহমদকে আমরা জানতে চাই, তা না। একই সঙ্গে ব্যক্তি তাজউদ্দীন আহমদকেও আমরা জানতে চাই।

তা আমি একটু শুরু করতে চাই শারমিন আপাকে দিয়ে। শারমিন আপা, আপনি যদি একটু বলেন যে, আপনি এবং সোহেল ভাই, আপনিও বলবেন। কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারছি যে বাবার সঙ্গে আপনার স্মৃতি একটু কম। আপনি বাবাকে বেশিদিন কাছে পাননি। তো অনুরূপভাবে শারমিন আপা বেশি পেয়েছিলেন, বেশি সময় ধরে এবং তার এই বইতেও আমরা সেটা দেখেছি।

তো শারমিন আপা, আপনি কি একটু শুরু করবেন যে, তার সাথে অর্থাৎ বাবার সাথে, তাজউদ্দীন আহমদের সাথে আপনার স্মৃতিটা কেমন ছিল?

এটা তো অনেক কথা, তবুও আপনি যদি সিলেক্টিভ কিছু স্মৃতির কথা বলতেন, যেগুলো আপনাকে খুব আনন্দ দেয় কিংবা খুব আপ্লুত করে।

শারমিন আহমদ :

শুভ অপরাহ্ন!

আপনাদের সবাইকে, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে ছুটির দিনে, আপনারা তাজউদ্দীন আহমদ, তাকে ভালোবেসেই কিন্তু এসেছেন। যেটা আমাদের একটা বড় পাওয়া। যারা এখানে এসেছেন, বোঝা যায় যে, তারা ওনাকে জানতে চান।

তো আমার ছোটবেলার স্মৃতিটা, একেবারে ছোটবেলার একটা স্মৃতি মনে পড়ে। সেটা হচ্ছে যে, উনি খুব ডিসিপ্লিন মানুষ ছিলেন। আমার বয়স যখন চার/পাঁচ, উনি প্রতিদিন আমাদের ভোরে ওঠাটা শেখাতেন। বলতেন যে, 'ভোরে যারা ওঠে না, ওর কাজেও কোনো বরকত আসে না।'

ভোরবেলা আমাদের উঠিয়ে দিতেন। আমাদের বয়স যখন চার বা পাঁচ বছর এবং উঠিয়ে আমাদের বাইরে নিয়ে লেফট-রাইট— সৈনিকের মতন করা শেখাতেন। তখন বয়স্কাউট আন্দোলনের সাথে সারাজীবন যুক্ত ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উনি সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নিয়েছিলেন।

তো এগুলো উনি ওনার বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কথাটা ভাবতেন। বলতেন, দেখো কোনো কিছু করতে হলে তোমাদের ডিসিপ্লিন হতে হবে। তখন তো ছোট– বুঝতাম না। কিন্তু উনি আমাদের কীভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়, তারপরে লেফট-রাইট করতে হয়— এটা শেখাতেন।

আর যখন আমরা ধানমন্ডির ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতাম, তখন যদি কোনো ময়লা পড়ে থাকত, উনি আবার ওইগুলো আমাদের দিয়ে পরিষ্কার করাতেন এবং নিজেও উঠাতেন। আর ফেরার পথে আমরা অজস্র বকুল ফুল, সেই আমাদের ধানমন্ডির ২১ নম্বর সাত মসজিদ রোডের জায়গাগুলো ভরা থাকত, আমরা আব্বুর সাথে ওই ফুলগুলো তুলে ঘরে

আসতাম। এগুলো দিয়ে আবার মালা গাঁথতাম। তো এই স্মৃতিটা আমার খুব মনে পড়ে এবং এটা আমার মনে এতটা দাগ কেটেছে যে, উনি তো ছোট বাচ্চাদের বলতে পারতেন, এত ছোট বাচ্চা! এদেরকে মায়া করে যে, ঘুমিয়ে থাকো। কিন্তু উনি আমাদের বললেন, ছোটবেলা থেকেই ভোরে ওঠার অভ্যাস করো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট।

আরেকটা স্মৃতি আমার মনে পড়ে যে, মানুষ তখনই ভালো হয়, যখন অজান্তে ভালো কিছু করে। কোনো চাওয়াপাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করে। ওখানে আমি বাবা তাজউদ্দীন আহমদের বাইরে, একজন মানুষ তাজউদ্দীন আহমদকে আবিষ্কার করি। আমার বয়স তখন ৯, ১৯৭০ সাল, ৯ না, ১০ আমার বয়স। '৭০ সালে ১২ নভেম্বর একটা মহাঘূর্ণিঝড় হয়। সেখানে বহু মানুষ মারা যায়। ঘরবাড়ি হারিয়ে ফেলে। তো তখন আমাদের বাড়িতে অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আম্মা আমাকে একটা কী কাজে আমার বাবাকে ডাকতে বলেছিলেন। আম্মা খুঁজছিলেন। তো আমি ওনাকে খুঁজতে যেয়ে, আমি তাকে আবিষ্কার করি যে আমাদের খোলা বারান্দা, ধানমন্ডির বাড়ির নিচতলার বারান্দায় একটা মানিপ্লান্টের গাছ, একটা টবে মানিপ্লান্টের গাছ ছিল, ওইটা হ্যাঙ্গিং প্লান্ট। ওখানে একটা বুলবুলি পাখি বাসা বেঁধেছিল। তো ওই বুলবুলি পাখিটা ঝড়ে মারা যায়— আমি তখন যেয়ে দেখি ওনার হাতের মধ্যে পাখিটা।

লিটারেলি উনি কাঁদছিলেন। ওনার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। তো আমাকে দেখে, হঠাৎ আমি আব্বু আব্বু করতে করতে গিয়েছি— দেখি পাখিটা নিয়ে আব্বু দাঁড়ানো। আব্বু আমাকে দেখে একটু এমব্যারেসড হয়ে

গেলেন। যেন উনি ধরা পড়ে গেলেন আর কি। যে ওনার ইমোশনটা, এই দুর্বলতাটা একটু প্রকাশ পেয়ে গেল।

তারপর মনে আছে উনি, বুলবুলি পাখির কথা মনে করে কিন্তু খেলেনও না। আর সারাদিন আফসোস করলেন যে, এত মানুষের আশ্রয় হলো আমাদের বাড়িতে আর এই পাখিটাকে যদি এই টবটার মধ্য থেকে ঘরে নিয়ে আসতাম তাহলে তো বেঁচে যেত। এটার মর্মটা তখন আমি ঠিক বুঝিনি, কিন্তু যখন বড় হলাম, আমি ভাবলাম— একজন ভালো নেতা হতে গেলে প্রথমে একজন ভালো মানুষ হতে হয়।

আর সেই মনুষ্যত্ববোধটা যখন থাকে, সেটা মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট সব জীবের প্রতি কিন্তু ওই মনুষ্যত্ববোধ আলোক ছড়াতে থাকে। তিনি এখানে একজন বুলবুলির আশ্রয় দেওয়া, আর এতগুলো মানুষের আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে তফাত করতে পারেননি।

ঠিক আমাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটা হাদিস মনে পড়ে। উনি যখন ওনার সাহাবিদের সাথে বসে মরুভূমির মধ্যে রাতে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, উনি তখন চট করে করে সেই আগুন নিভিয়ে বললেন, এখানে আগুন জ্বালিও না। তারা রাতের জন্য আগুন জ্বালিয়েছিলেন। তো তিনি বললেন, এখানে আগুন জ্বালানো যাবে না।

তো সরে আরেকটা জায়গায় বসলেন। ওইখানে আসলে উইপোকার ঢিবি ছিল। এই যে সূক্ষ্ম বোধটা, এটাই কিন্তু মনুষ্যত্ব। আমি আমার বাবার মধ্যে ওই বোধটা, মানুষ তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে— এটা আমি দেখেছি।

আরেকটা স্মৃতি হচ্ছে, নেতা তাজউদ্দীন আহমদকে আবিষ্কার করা। যে যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের সময় উনি একটা পণ করলেন, আমি আর পারিবারিক জীবনযাপন করব না। এটা বিশাল একটা ধনুক ভাঙা পণ ছিল। সেটা থেকে কিন্তু উনি বিচ্যুত হননি। উনি বলেছিলেন, এত এত মুক্তিযোদ্ধা, যারা রণাঙ্গনে নিজের পরিবার ছাড়া যুদ্ধ করছে, আমি তাদের নেতা হয়ে কীভাবে পারিবারিক জীবনযাপন করব।

তো ওই কথাতে, উনি পুরোটা সময় কিন্তু অফিসে থাকতেন। নিজের রুমে থাকতেন। মন্ত্রিসভার মধ্যে উনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, ওই শপথটা রক্ষা করেছিলেন।

আমার ছোট বোন রিমির জন্মদিন ছিল। উনিশে আগস্ট। ওইদিনই আমরা সংবাদ পেলাম, কিছু মুক্তিযোদ্ধা এসে বলল যে, আপনার বাবা খুবই অসুস্থ।

তখন আমরা জানি যে, আব্বুকে যদি আমরা ফোন করি, উনি দেখা করবেন না। আমরা তখন থাকতাম আরেকটু দূরে, অন্য একটা ফ্ল্যাটে। তখন আমরা ভাবলাম, আব্বুকে না বলি। আম্মা, আমি, রিমি আর বদরুন্নেসা আহমেদ, যার নামে বদরুন্নেসা কলেজ— আমরা আব্বুকে দেখতে গেলাম সেই ৮ নম্বর থিয়েটার রোড। যেটা বর্তমানে শেক্সপিয়ার সরণি। সেটা যদি আমাদের সরকার, রাষ্ট্র সংরক্ষণ করত অনেক ভালো হতো।

যাই হোক, সেখানে গিয়ে আব্বুকে ওনার ঘরে খুঁজে পেলাম না। তবে ওরা বলল, স্যার ঘরেই তো আছেন। তখন দেখি বাথরুম থেকে কাপড় কাচার আওয়াজ। আমরা দেখি বাথরুমের লাইটটা জ্বলছে। আর দরজাটা আধা খোলা। সাথে কাপড় কাচার কুচকুচ শব্দ। তো আমরা ওই দরজা দিয়ে যখন ঢুকেছি, তখন দেখি আমার আব্বু একটা লুঙ্গি

আর সাদা গেঞ্জি পরে বসে কাপড় কাচছেন এবং আমাদেরকে দেখে, হঠাৎ চলে এসেছি তো, আমাদেরকে দেখে যখন পেছনে ঘুরেছেন, তখন দেখি আব্বুর সাদা গেঞ্জিটা একদম রক্তে লাল।

ওখানে তো ফোড়া হয়েছিল, জ্বর। তার মধ্যে একমাত্র শার্টটা কেচে নিচ্ছেন। পরের দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর কেনেডি আসবেন, রিফিউজিদের অবস্থা দেখবেন। উনি তখন রিফিউজি কমিশনের সভাপতি, মার্কিন কংগ্রেসের। উনি সরেজমিন দেখবেন। তো ওনার একমাত্র শার্টটি কেচে নিচ্ছেন।

আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। আমি একজন নেতাকে আসলে এভাবেই আবিষ্কার করেছিলাম। এই তিনটা স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল।

আহমাদ মোস্তফা কামাল :

অনেক অনেক ধন্যবাদ শারমিন আপা। সোহেল ভাই, এখন আপনি যদি একটু বলেন।

সোহেল তাজ :

আজকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ। ঐতিহ্য প্রকাশনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আহমেদ মোস্তফা কামাল সাহেবকে, এই প্রোগ্রামটা হোস্ট করার জন্য এবং আমার খুব বলার ইচ্ছা সবসময় গুড ইভিনিং-এর জায়গায় শুভ অপরাহ্ণ।

আজকে সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুভ অপরাহ্ণ। আমার বড় বোন তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে যে কথাগুলো বললেন, এটা সবার মনে দাগ কেটেছে। উনি

আসলে ব্যক্তি হিসেবে যে আদর্শ, নীতি ধারণ করেছিলেন ওনার জীবনের প্রত্যেকটা ফেসেটে সেই নীতি, আদর্শ দিয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করেছেন।

তো আমার বাবার সাথে আমার স্মৃতি প্রায় ছয় বছরের অলমোস্ট। সাড়ে পাঁচ, ছয় বছরের মতো। সো আমার যে স্মৃতি আছে, এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি আছে। যে স্মৃতিগুলো সেই সময় আমি হয়তো-বা উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্তু পর্যাপ্ত বয়স যখন হলো আমার, তখন সেই স্মৃতিগুলো আমাকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং এখনো দিয়ে যায়।

ছোটবেলায়, মানে আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে, ৩ নভেম্বর জেলখানায়, তারপর সবার মুখে শুনতাম যে, তাজউদ্দীন আহমদ কত বড় মাপের নেতা ছিলেন, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী— অনেক কথা শুনেছি মানুষের মুখে। তখন খুব আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম যে, এই ব্যক্তিটাই আমার পিতা!

তো গর্বিত হতাম ছোট বয়সে। কিন্তু আসল মর্মটা হয়তো বুঝে ওঠার ক্ষমতা ছোটবেলায় ছিল না। তো এখন সেটা উপলব্ধি করতে পারছি। আবার জীবনের দু-চারটা ঘটনা ঘটেছে। যেটা রি-ইনফোর্স করেছে। ছোট কিছু ঘটনা।

এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। টেলিভিশন আছে হাজারখানেক। রাইট? আমাদের বিনোদনের জন্য সবকিছু অ্যাভেইলেবল। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি, ’৭৩/৭৪ সাল, তখন একটা টিভি চ্যানেল ছিল, বিটিভি।

এবং বিটিভির সম্প্রচার আবার শেষ হয়ে যেত রাত দশটার সময়। সো অনেক সময় রাতের বেলায় আব্বু, বড় আপা আরো বলেছেন যে, সকালবেলায় উঠে, আমারও স্মৃতি

আছে, আমার বাবা যখন ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিলেন, হেয়ার রোডের বাসায় আমরা থাকতাম।

হেয়ার রোডের বাসায় আমাদের একটা বারান্দা ছিল পেছনের দিকে একটা জায়গা। তো আমি ওখান থেকে সকালবেলায় উঠে দেখতাম, আমার বাবা উঠে, বড় আপা যেটা বলেছেন যে এক্সারসাইজ করছেন এবং খুব ডিসিপ্লিনভাবে এই জিনিসগুলো আমাদেরকেও শিখিয়েছেন। সো এই একটা ইমপ্রেশন ছিল।

ওই ইমপ্রেশনটা ক্যারি ওভার করেছে অন্যান্য ফ্যাসেট অব হিজ লাইফ। যেমন যেটা বলছিলাম, টিভি। রাতের বেলায় নিউজ হতো। নিউজ শেষ হয়ে গেলে জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় পতাকা দেখানো হতো বিটিভিতে— যেটা এখনো বোধহয় হয়।

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টা হচ্ছে, আমরা যেখানে থাকতাম, আমি ইউজুয়ালি বাবার সাথে টিভি দেখতাম, নিউজ দেখতাম। তো পতাকা এবং জাতীয় সংগীত শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে উনি সব সময় বলতেন, এখন দাঁড়াতে হবে এবং দাঁড়িয়ে এই পতাকা এবং জাতীয় সংগীতকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে, স্যালুট করতে হবে।

এবং এটার এক্সপ্লেনেশন দিতেন। কারণ এই পতাকার জন্য হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা জীবন দিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। সো আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের এই রক্তের ঋণটার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। আর কিছু যদি নাও করতে পারি, শ্রদ্ধাটা দিতে হবে।

এই যে বড় আপা যে কথাটা বলেছেন যে, উনি ঘরে যেমন ছিলেন, বাইরেও তেমন ছিলেন। দ্যাট শোওজ ক্যারেক্টার।